দাম্পত্য জীবনের মাধুর্য ও তিক্ততা

ইসলামের নির্দেশনা



মাওলানা হাসীবুর রহমান

গবেষণামূলক উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মারকাযুদ্ দাওয়াহ্ আলইসলামিয়া ঢাকা-এর মুখপত্র ‘মাসিক আলকাউসার’ পত্রিকায় ২০০৮ সালের নভেম্বর ও ডিসেম্বর সংখ্যায় এবং পরের বছর জানুয়ারী সংখ্যায় “দাম্পত্য জীবনের মাধুর্য ও তিক্ততাঃ ইসলামের নির্দেশনা” শিরোনামের প্রবন্ধটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। বৈবাহিক জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সুখকর সময়ও যেমন কাটে, তেমনি কখনো কখনো আসে কষ্টের সময়ও। পরস্পরের প্রতি তৈরি হয় নানারকম অভিযোগ। কোনো কোনো দম্পতির মধ্যে এ থেকে বেড়ে যেতে পারে তিক্ততা এবং ফলশ্রুতিতে এক ছাদের নিচে সংসার করাটা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

এই প্রবন্ধটিতে ইসলামের আলোকে উপস্থাপন করা হয়েছে উত্তম স্বামী ও স্ত্রীর বৈশিষ্ট্য এবং দাম্পত্য জীবন সুন্দর করতে কার কী করণীয়। পাশাপাশি আলোকপাত করা হয়েছে তিক্ততাপূর্ণ পরিস্থিতির ইনসাফপূর্ণ সমাধান কিভাবে হতে পারে তার ওপর।

বর্তমান দম্পতিরা তো বটেই, হবু দম্পতিরাও এই প্রবন্ধ থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে সক্ষম হবেন ইনশাআল্লাহ্।

আল্লাহ্ তা’আলা তাঁর বান্দাদের দাম্পত্য জীবনকে মাধুর্যপূর্ণ করে দিন এবং সকল প্রকার ফিতনা ও তিক্ততা থেকে হেফাজত করুন। আ-মীন।

সংকলক

(একজন ‘আব্দুল্লাহ্)

সূচীপত্র

আল্লাহ তাআলার অশেষ শুকরিয়া। তিনি মুসলমানকে ইসলামের মতো পূর্ণাঙ্গ দ্বীন দান করেছেন। নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত আদায় করার পথ ও পন্থা যেমন বলে দিয়েছেন তেমনি লেনদেন, আচার-আচরণ, পারিবারিক ও সামাজিক জীবন কেমন হবে তাও জানিয়ে দিয়েছেন। বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে দাম্পত্যজীবন ও পারিবারিক জীবনের সূচনা হয়। ইসলামী শরীয়তে এই সম্পর্ক কায়েম করতে হলে যেমন সুনির্ধারিত কিছু বিধান রয়েছে তেমনি প্রয়োজনে এই সম্পর্ক ছিন্ন করতে হলেও সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে। কুরআন-হাদীসে সেগুলো অনুসরণ করারও জোর তাগিদ দেওয়া হয়েছে। যদি সেই বিধানগুলো মান্য না করা হয় তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করা হবে, যা একটি মারাত্মক গুনাহ। সাথে সাথে এই অমান্য করার কারণে জীবনের পদে পদে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে এবং অসংখ্য বালা-মুসীবতে নিপতিত হতে হবে, যার বাস্তব নমুনা আমাদের সমাজ জীবনে প্রতিদিন সৃষ্টি হচ্ছে এবং পেপার-পত্রিকায় সেগুলো শিরোনাম হচ্ছে। বিশেষত শরীয়ত পরিপন্থী পদ্ধতিতে তালাক প্রদান করে দাম্পত্য জীবনের অবসান ঘটালে যে পেরেশানি ও জটিলতা সৃষ্টি হয় তা বর্ণনাতীত।

বিবাহ করার উদ্দেশ্য তালাক দেওয়া নয়

বিবাহের মাধ্যমে যে দাম্পত্য সম্পর্কের সূচনা হয় তা অটুট থাকা এবং আজীবন স্থায়ীত্ব লাভ করা ইসলামে কাম্য। সুতরাং স্বামী কখনও বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করার চেষ্টা করবে না এবং বিবাহ-বিচ্ছেদের পরিস্থিতিও সৃষ্টি করবে না। কেননা বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হলে এর কুপ্রভাব শুধু স্বামী-স্ত্রীর উপর সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং গোটা পরিবারটিই তছনছ হয়ে যায়, সন্তান-সন্ততির জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। কোনো কোনো সময় এই ঘটনার জের পরিবারের গন্ডি অতিক্রম করে বংশীয় কোন্দলে পরিণত হয় এবং সামাজিক জীবনে এর অত্যন্ত খারাপ প্রভাব পড়ে। এজন্য যে সকল কারণে দাম্পত্য সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার উপক্রম হয় সেগুলো দূর করার জন্য ইসলামী শরীয়ত বিভিন্ন বিধান দিয়েছে এবং এ বিষয়ে কুরআন-হাদীসে অনেক নির্দেশনা রয়েছে। প্রথমে বুঝিয়ে-শুনিয়ে সমাধান করতে বলা

হয়েছে। এরপর স্ত্রীর সাথে শয্যা ত্যাগ, সতর্ক করা, শাসন করার পথ অবলম্বন করার আদেশ করা হয়েছে। এতটুকুতে মীমাংসা না হলে উভয় পক্ষে দুজন শালিস নিযুক্ত করে একটি চূড়ান্ত ফয়সালায় উপনীত হওয়ার নির্দেশনা দিয়েছে। এগুলো হল দাম্পত্য জীবনে ইসলামী হেদায়েতের অনন্য বৈশিষ্ট্য। আফসোস! আমাদের যদি বোধোদয় হত এবং ইসলামী নির্দেশনাকে আদর্শ বানাতে পারতাম! সুতরাং আবেগের বশিভূত হয়ে নয়; বরং বুঝে-শুনে, চিন্তা-ফিকির করে যেকোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত।

স্বামী-স্ত্রীর প্রতি কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশনা

সাধারণত বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হওয়ার পিছনে মৌলিক যে কারণগুলো থাকে সেগুলো হল, স্বামী-স্ত্রী একে অপরের হক যথাযথ আদায় না করা। একজন অন্যজনকে গুরুত্ব না দেওয়া। কথায়-কাজে অযথা দ্বিমত পোষণ করা। একে অন্যের প্রতি আস্থা না রাখা, বিশ্বাস না করা। এ সকল কারণে একসময় তাদের মাঝে হিংসা-বিদ্বেষ চরমে পৌঁছে এবং দাম্পত্য জীবন ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হয়। সুতরাং উভয়ের কর্তব্য হল, পরস্পরের হকগুলো যথাযথভাবে জানা এবং তা আদায় করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা। কোনো ক্ষেত্রে দোষ-ত্রুটি হয়ে গেলে তা অকপটে স্বীকার করে নেওয়া এবং অতি দ্রুত সেটাকে শুধরে নেওয়া। এভাবে সবকিছুকে সহজভাবে মেনে নেওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা। তাহলে সম্পর্ক দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হবে। এরকম শুধরে নেওয়া ও মেনে নেওয়ার অভ্যাস গড়ে না তুললে সামান্য মনোমালিন্যেও অন্তরে প্রচন্ড কষ্ট অনুভব করবে। এখানে স্বামী-স্ত্রীর কিছু শরয়ী হক তুলে ধরা হল।

স্বামীর ওপর স্ত্রীর হকসমূহ

১. স্ত্রীর সাথে সর্বদা ভালো আচরণ করা।

২. স্ত্রীর কোনো কথায় বা কাজে কষ্ট পেলে ধৈর্য্য ধারণ করা।

৩. উচ্ছৃঙ্খল, বেপর্দা চলাফেরা করতে থাকলে নম্র ভাষায় তাকে বোঝানো।

৪. সামান্য বিষয় নিয়ে স্ত্রীর সাথে ঝগড়া-বিবাদ না করা। কথায় কথায় ধমক না দেওয়া। রাগ না করা।

৫. স্ত্রীর আত্মমর্যাদায় আঘাত করে এমন বিষয়ে সংযত থাকা। শুধু শুধু স্ত্রীর প্রতি কুধারণা না করা। স্ত্রীর সম্পর্কে উদাসীন না থাকা।

৬. সামর্থ্যানুযায়ী স্ত্রীর খোরপোষ দেওয়া। অপচয় না করা।

৭. নামায পড়া এবং দ্বীনের আহকাম মেনে চলার জন্য উৎসাহ দিতে থাকা। হায়েয-নেফাসের মাসআলাগুলো ভালোভাবে শিক্ষা দেওয়া। শরীয়ত পরিপন্থী কাজ থেকে বিরত রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করা।

৮. একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের মাঝে সমতা রক্ষা করা।

৯. চাহিদানুযায়ী তাদের সাথে মেলামেশা করা।

১০. অনুমতি ব্যতীত আযল অর্থাৎ মেলামেশার সময় শেষ মুহূর্তে স্বাভাবিক স্থান ত্যাগ না করা।

১১. একান্ত নিরুপায় না হলে তালাক না দেওয়া এবং প্রয়োজনের ক্ষেত্রে শরীয়ত-গৃহীত পন্থায় তালাক দেওয়া।

১২. প্রয়োজন মাফিক থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা।

১৩. মাঝে মাঝে স্ত্রীর নিকটাত্মীয়দের সাথে দেখা-সাক্ষাত করার সুযোগ করে দেওয়া।

১৪. স্ত্রীর সাথে মেলামেশার চিত্র অন্যের কাছে বর্ণনা না করা।

১৫. প্রয়োজনে স্ত্রীকে শাসন করা। সতর্ক করা। শরীয়ত যতটুকু অনুমতি দিয়েছে তার চেয়ে বেশি হাত না তোলা।

স্ত্রীর ওপর স্বামীর হকসমূহ

১. সর্বদা স্বামীর মন জয় করার চেষ্টা করা।

২. স্বামীর সাথে অসংযত আচরণ না করা। স্বামীকে কষ্ট না দেওয়া।

৩. শরীয়তসম্মত প্রত্যেক কাজে স্বামীর আনুগত্য করা। গুনাহ্ এবং শরীয়ত বিরোধী কাজে অপারগতা তুলে ধরা এবং স্বামীকে নরম ভাষায় বোঝানো।

৪. প্রয়োজনাতিরিক্ত ভরণ-পোষণ দাবি না করা।

৫. পরপুরুষের সাথে কোনো ধরনের সম্পর্ক না রাখা।

৬. স্বামীর অনুমতি ছাড়া কাউকে ঘরে ঢোকার অনুমিত না দেওয়া।

৭. অনুমতি ছাড়া ঘর থেকে বের না হওয়া।

৮. স্বামীর সম্পদ হেফাযত করা। অনুমতি ছাড়া সেখান থেকে কাউকে কোনো কিছু না দেওয়া।

৯. স্বামীকে অসন্তুষ্ট করে অতিরিক্ত নফল নামাযে মশগুল না থাকা। অতিরিক্ত নফল রোযা না রাখা।

১০. স্বামী মেলামেশার জন্য আহবান করলে শরীয়তসম্মত কোনো ওযর না থাকলে আপত্তি না করা।

১১. স্বামীর আমানত হিসেবে নিজের ইজ্জত-আব্রু হেফাযত করা। কোনো ধরনের খেয়ানত না করা।

১২. স্বামী দরিদ্র কিংবা অসুন্দর হওয়ার কারণে তাকে তুচ্ছ না করা।

১৩. স্বামীকে কোনো গুনাহের কাজ করতে দেখলে আদবের সাথে তাকে বিরত রাখা।

১৪. স্বামীর নাম ধরে না ডাকা।

১৫. কারো কাছে স্বামীর বদনাম, দোষ-ক্রুটি বর্ণনা না করা।

১৬. শ্বশুর-শাশুড়িকে সম্মানের পাত্র মনে করা। তাদেরকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করা। ঝগড়া-বিবাদ কিংবা অন্য কোনো উপায়ে তাদের মনে কষ্ট না দেওয়া।

১৭. সন্তানদের লালন-পালনে অবহেলা না করা।

উত্তম স্ত্রীর গুণাবলি

কুরআন-হাদীসের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, উত্তম স্ত্রী হল যে স্বামীকে সম্মান করে। স্বামীর বশ্যতা স্বীকার করে। স্বামীর আদেশ-নিষেধ মান্য করে। স্বামীর ধন-সম্পদ হেফাযত করে এবং অন্যান্য হকসমূহ যথাযথভাবে আদায় করে। সাথে সাথে নিজের সতীত্ব রক্ষা করে, শরীয়তের বিধানুসারে জীবন পরিচালনা করে।

স্বামীর উপস্থিতি-অনুপস্থিতি সর্বাবস্থায় নিজের সতীত্ব এবং স্বামীর ধন-সম্পদ হেফাযত করা স্ত্রীর কর্তব্য। সাধারণত এদু'টি ক্ষেত্রে মহিলাদের থেকে সবচেয়ে বেশি খেয়ানত হয়ে থাকে। কোনো কোনো মহিলার ক্ষেত্রে এমনও ঘটে যে, স্বামী ঘর থেকে বের হলে, চাকরি বা অন্য কোনো স্থানে গেলে, সেই সুযোগে স্বামীর অজান্তে নিজেকে নাফরমানির কাজে জড়িয়ে ফেলে। স্বামীর উপস্থিতিতে এটা সে করতে পারত না। বাহ্যিক দৃষ্টিতে এতে স্বামীকে ধোকা দেওয়া হলেও প্রকারান্তরে এটা হচ্ছে নিজের জীবনে অভিশাপ টেনে আনা। সুতরাং স্ত্রীর অবশ্যকর্তব্য হল, আল্লাহকে হাযির-নাযির জেনে স্বামীর উপস্থিতি-অনুপস্থিতি সর্বাবস্থায় নিজের ইজ্জত-আব্রু সংরক্ষণ করা। হাদীস শরীফে আছে-'উত্তম স্ত্রী হল, যখন তুমি তার দিকে তাকাও তখন সে তোমাকে আনন্দিত করে। যখন তাকে আদেশ কর তখন সে আনুগত্য করে আর যখন তুমি স্থানান্তরে যাও তখন সে তার ইজ্জত-আব্রু রক্ষা করে এবং সম্পদ হেফাযত করে।'

আর যে স্ত্রী শরীয়তের হুকুম মেনে চলে, স্বামীর আদেশ মান্য করে, তার খেদমত করে, নিজের সতীত্ব রক্ষা করে হাদীস শরীফে তার জন্য জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে।

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে নারী পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে, রমযান মাসের রোযা রাখে, লজ্জাস্থানের হেফাযত করে এবং স্বামীর অনুগত থাকে তাকে বলা হবে তুমি যে দরজা দিয়ে চাও জান্নাতে প্রবেশ কর।' (মুসনাদে আহমদ হাদীস ১৬৬১)

পক্ষান্তরে যে স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে ভালো আচরণ করে না এবং স্বামী তার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকে তার সম্পর্কে হাদীস শরীফে এসেছে যে, 'তার কোনো নামায কবুল হয় না, কোনো নেক আমল উপরে উঠানো হয় না যতক্ষণ স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট না হবে। (সহীহ ইবনে হিববান হাদীস ৫৩৫৫)

অন্য হাদীসে আছে-হুসাইন ইবনে মুহসিন থেকে বর্ণিত, তাঁর এক ফুফু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে কোনো প্রয়োজনে এসেছিলেন। তাঁর প্রয়োজন পূর্ণ হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি বিবাহিতা? তিনি বললেন, জ্বী হাঁ। নবীজী বললেন, তুমি স্বামীর সাথে কেমন আচরণ করে থাক? তিনি বললেন, আমি একেবারে অপারগ না হলে তার সেবা ও আনুগত্যে ক্রটি করি না। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, স্বামীর সাথে তোমার আচরণ কেমন তা ভেবে দেখ। কারণ স্বামীই তোমার জান্নাত কিংবা জাহান্নাম। (মুসনাদে আহমদ খ. ৪, পৃ. ৩৪১৩; খ. ৬, পৃ. ৪১৯)

উত্তম স্বামী

একটি পরিবার সুন্দর ও সুখময় করে গড়ে তোলার জন্য স্বামীর কর্তব্য সবচেয়ে বেশি। সুতরাং সে যেন স্ত্রীর খুটিনাটি বিষয় নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ না করে এবং স্ত্রীকে সব কথা মেনে নেওয়ার জন্য

বাধ্য না করে। কেননা নারীদেরকে সৃষ্টিই করা হয়েছে নাযুক তবিয়ত দিয়ে। অতএব স্ত্রীর ওপর অধিক চাপ প্রয়োগ করতে থাকলে হিতে বিপরীত হওয়ার আশংকাই বেশি।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে-

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, নারীকে সৃষ্টি করা হয়েছে পাঁজরের হাড্ডি দ্বারা। তুমি যদি তাকে সোজা করতে যাও তাহলে ভেঙ্গে ফেলবে। তাই তার মন রক্ষা করে চল। তাহলেই একসাথে জীবন যাপন করতে পারবে। (সহীহ ইবনে হিববানঃ হাদীস ৪১৭৮)

আরেকটি হাদীসে আছে-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘তোমরা স্ত্রীদের সাথে উত্তম আচরণ কর। কেননা তাদেরকে পাঁজরের হাড্ডি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর পাঁজরের হাড্ডিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বাঁকা হল উপরেরটি। সুতরাং তুমি যদি তা সোজা করতে যাও তাহলে ভেঙ্গে ফেলবে। আর যদি একেবারে ছেড়ে দাও তাহলে বাঁকাই থেকে যাবে। তাই স্ত্রীদের সাথে উত্তম আচরণ কর।’ (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

অন্য হাদীসে এসেছে, তুমি যদি স্ত্রীকে সোজা করতে যাও তাহলে ভেঙ্গে ফেলবে। আর ভাঙ্গার অর্থ তাকে তালাক প্রদান করা। (সহীহ মুসলিম)

অতএব স্বামী নিজেকে সংযত রাখবে। সবকিছু ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবে। ছাড় দেওয়া ও মায়া-মমতার মাধ্যমে যতদূর সম্ভব দাম্পত্য জীবন স্থায়ী করার আপ্রাণ চেষ্টা করবে। মাথা গরম করে দীর্ঘ দাম্পত্য জীবন এক নিমিষেই শেষ করে দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

অবাধ্য স্ত্রীকে সংশোধনের কয়েকটি নির্দেশনা

কোনো স্ত্রী যদি স্বামীর আনুগত্য না করে, স্বামীর হক আদায় না করে বরং উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করতে থাকে তাহলে স্বামীর দায়িত্ব হল তাকে সংশোধনের জোর চেষ্টা করা। শরীয়ত এ ধরনের স্ত্রীকে

সুশৃংখল জীবনে ফিরিয়ে আনতে কিছু দিক-নির্দেশনাও দিয়ে দিয়েছে। স্বামী প্রথমে সেগুলো অনুসরণ করবে। তারপরও যদি স্ত্রীর মধ্যে কোনো পরিবর্তন না আসে এবং সে তার মন মতোই চলতে থাকে তাহলে চূড়ান্ত ফয়সালা তালাক দেওয়ার পথ বেছে নিতে পারবে। তবে মনমতো তালাক দেওয়া যাবে না। শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে তালাক প্রদান করতে হবে।

প্রথম পদক্ষেপ

স্ত্রীর এই অবাধ্যতা দেখে উত্তেজিত হবে না এবং ঝগড়া-বিবাদের পথ অবলম্বন করবে না; বরং নিজেকে সংযত রাখবে এবং স্ত্রীকে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে বোঝাতে থাকবে । স্ত্রীর প্রতি মায়া-মুহাববত প্রকাশ করে তার মন গলানোর চেষ্টা করবে। স্ত্রী কোনো ভুল ধারণায় থাকলে যথাসম্ভব তা দূর করার চেষ্টা করবে। স্ত্রী যদি স্বামীর এই মহৎ আচরণে মুগ্ধ হয়ে নিজেকে স্বামীভক্ত বানিয়ে ফেলে তাহলে একটি সুখী পরিবার রচিত হবে এবং স্বামী অন্তর্জবালা থেকে মুক্তি পাবে। আর স্ত্রী অবাধ্য থাকার কারণে যে গুনাহে লিপ্ত ছিল তা থেকে সে পরিত্রাণ পাবে। যদি এই চেষ্টা বিফলে যায় তাহলে দ্বিতীয় নির্দেশনা অবলম্বন করবে।

দ্বিতীয় পদক্ষেপ

স্ত্রীর ব্যবহারে রাগ-অনুরাগ প্রকাশ করার জন্য স্বামী স্ত্রীর সাথে একত্রে রাতযাপন করা থেকে বিরত থাকবে। স্ত্রীর ঘুমানোর জায়গা পৃথক করে দিবে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে এটা সাধারণ একটি শাস্তি, কিন্তু মনস্তাত্বিক বিচারে সর্বোত্তম সতর্কবাণী। স্ত্রী যদি এতেই সতর্ক হয়ে যায় এবং নিজেকে সংশোধন করে নেয় তাহলে দাম্পত্য জীবন সুখের হবে। অশান্তি-পেরেশানী দূর হবে। আর যদি এই ভদ্রোচিত সাজা স্ত্রীর অবাধ্যতা ও বক্রতার মধ্যে কোনো পরিবর্তন না আনে তাহলে তৃতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে।

তৃতীয় পদক্ষেপ

উল্লেখিত দুটি পদক্ষেপ গ্রহণ করার পরও কোনো কাজ না হলে তৃতীয় পদক্ষেপ হিসেবে শরীয়ত স্ত্রীকে হালকা শাসন, হাত উঠানোর অনুমতি দিয়েছে। তবে রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে নয়; বরং অন্তরে

মুহাববত পোষণ করে বাহ্যিকভাবে স্ত্রীকে ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যে এটা করা যাবে। লক্ষ রাখতে হবে যেন এর কারণে তার শরীরে কোনো দাগ না পড়ে এবং চেহারা বা স্পর্শকাতর কোনো স্থানে আঘাত না আসে। অবশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীদেরকে এ ধরনের শাস্তি দেওয়া পছন্দ করেননি। তাই এই পন্থা পরিত্যাগ করাই শ্রেয়। কেউ কেউ স্ত্রীকে শাসনের নামে বেধড়ক মারপিট করে থাকে, যা শরীয়ত সমর্থন করে না এবং এটা স্ত্রীর ওপর সুস্পষ্ট জুলুম। যাহোক এই যৎসামান্য শাসনের মাধ্যমেও যদি মোআমালা সাফ হয়ে যায় এবং উভয়ে আপোষ-মীমাংসায় পৌঁছে যায় তাহলেও মাকসাদ হাসিল হয়ে যাবে। ঘরে-সংসারে শান্তি ফিরে আসবে।

স্ত্রীকে সংশোধনের জন্য এই তিনটি পদক্ষেপ গ্রহণের কথা কুরআনুল কারীমের একটি আয়াতে একত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে- (তরজমা)

“স্ত্রীদের মধ্যে যাদের অবাধ্যতার আশংকা কর তাদেরকে সদুপদেশ দাও। তারপর তাদের শয্যা বর্জন কর। অতঃপর তাদেরকে প্রহার কর। যদি তারা তোমাদের অনুগত হয় তবে তাদের বিরুদ্ধে কোনো পথ অন্বেষণ করো না।”

পরস্পর সম্পর্ক বজায় রাখার সর্বশেষ পদক্ষেপ

উপরোক্ত পদক্ষেপগুলো এজন্য রাখা হয়েছে যেন স্বামী-স্ত্রীর ব্যক্তিগত সমস্যা তারা নিজেরাই যেন সমাধান করতে পারে। কিন্তু কখনও কখনও ঝগড়া-বিবাদ এত চরম আকার ধারণ করে যে, চাই সেটা স্ত্রীর অবাধ্যতা ও বল্গাহীন চলাফেরা করার কারণে হোক কিংবা স্বামীর অন্যায় আচরণ, অমানবিক নির্যাতনের কারণে হোক তখন আর ঘরের কথা ঘরে থাকে না বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে। এতে সাধারণত দেখা যায়, এক পক্ষের লোক অন্য পক্ষ সম্পর্কে কটুক্তি করে এবং অপবাদ রটাতে থাকে। যার ফলে উভয় পরিবার ও পক্ষ-বিপক্ষের লোকদের মাঝে হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। একপর্যায়ে এটা পারিবারিক কোন্দল থেকে বংশীয় কোন্দলে পরিণত হয়।

কুরআনুল করীমে এই বিবাদ-বিসম্বাদ দূর করার জন্য এবং পরস্পর সুস্থ আপোষ-মীমাংসায় উপনীত হওয়ার জন্য একটি স্বচ্ছ ও কার্যকরী পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন- (তরজমা) যদি স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হওয়ার মতো পরিস্থিতির আশংকা কর তাহলে স্বামীর পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিস নিযুক্ত করবে। তারা উভয়ে নিষ্পত্তি চাইলে আল্লাহ তাদের মধ্যে মীমাংসার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -সূরা নিসা ৩৫

তবে উভয় সালিসের মধ্যে নিম্নোক্ত গুণাবলী থাকা আবশ্যক।

১. জ্ঞানী হওয়া

২. সুবিবেচক হওয়া

৩. নেক নিয়তে ফয়সালা করার মানসিকতা থাকা। অর্থাৎ তাদের অন্তরের একান্ত কামনা থাকবে যে, স্বামী স্ত্রীর মাঝে একটি সুষ্ঠু ফয়সালা হোক। এজন্য তারা যথাসাধ্য চেষ্টাও করবে। যখন এই সালিসদ্বয় ইখলাসের সাথে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মীমাংসা করার জন্য প্রচেষ্টা চালাবে তখন আল্লাহ তাআলার গায়েবী মদদ তাদের সাথে থাকবে। ফলে তাদের বিচারকার্যের মাকসাদ হাসিল হবে এবং তাদের অসীলায় আল্লাহ তাআলা স্বামী-স্ত্রী উভয়ের অন্তরে মুহাববত ও সম্প্রীতির বন্ধন সৃষ্টি করে দিবেন। ইনশাআল্লাহ।

তালাক হল চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত

পরিস্থিতি কখনো এমন নাযুক হয়ে যায় যে, মীমাংসা ও সংশোধনের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়। কোনোক্রমেই একমতে পৌঁছা সম্ভব হয় না। দাম্পত্য জীবন থেকে সাফল্য লাভ হওয়া তো দূরের কথা, একে অপরের চেহারা পর্যন্ত দেখতে চায় না। যতদ্রুত সম্ভব বিচ্ছেদ ঘটালেই তারা হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। এরকম চূড়ান্ত পর্যায়ে গেলে শরীয়ত স্বামীকে তালাক দেওয়ার এখতিয়ার দিয়েছে। তবে তালাক

দেওয়া অত্যন্ত অপছন্দনীয় ও ঘৃণিত কাজ। তারপরও তালাক দেওয়া ছাড়া অন্য কোনো পথ খোলা না থাকলে শরীয়ত সমর্থিত পদ্ধতি অনুসরণ করে তালাক দিবে। এই পদ্ধতি অনুসরণ করার সুফল অনেক।

তালাক দেওয়ার সর্বোত্তম পদ্ধতি

কুরআন-হাদীসের নির্দেশনা এবং সাহাবা-তাবেঈনের আমল থেকে প্রমাণিত হয় যে, তালাক দেওয়ার সর্বোত্তম পদ্ধতি হল, স্ত্রী যখন হায়েয থেকে পবিত্র হবে তখন স্বামী তার সঙ্গে সহবাস না করে সুস্পষ্ট শব্দে এক তালাক দিবে। যেমন স্বামী স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলবে, আমি তোমাকে এক তালাক দিলাম। এরপর স্বামী যদি স্ত্রীকে ইদ্দত চলা অবস্থায় ফিরিয়ে নেয় তাহলে ভালো। পুনরায় স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক কায়েম হয়ে যাবে। অন্যথায় ইদ্দত শেষ হওয়ার সাথে সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং স্ত্রী স্বামী থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে যাবে। এখন স্ত্রী স্বাধীন। ইচ্ছা করলে সে অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। ফকীহগণ এভাবে তালাক দেওয়াকে 'তালাকে আহসান' বলেছেন। সাহাবায়ে কেরামও এই পদ্ধতিকে সর্বোত্তম পদ্ধতি বিবেচনা করেছেন। সুতরাং তালাক দিতে একান্ত বাধ্য হলে এই পদ্ধতিতে তালাক দেওয়া কর্তব্য।

সর্বোত্তম পদ্ধতিতে তালাক দেওয়ার সুফলসমূহ

এ পদ্ধতির গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সুফল হল:

১. অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় তালাকের পরে স্ত্রীই বেশি অনুতপ্ত হয় এবং বৈবাহিক সম্পর্ক পুনর্বহাল করার আপ্রাণ চেষ্টা করে। যদি শরীয়তের নির্দেশনা অনুযায়ী এক তালাক দেওয়া হয় তাহলে এই আশা পূরণ হওয়ার সুযোগ থাকে এবং তারা পুনরায় বৈবাহিক জীবন শুরু করতে পারে। কিন্তু স্বামী

একসাথে তিন তালাক দিলে ইদ্দত চলা অবস্থায়ও স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়ার সুযোগ থাকে না এবং ইদ্দতের পরেও নতুনভাবে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার অবকাশ থাকে না। তারা একে অপরের জন্য সম্পূর্ণ হারাম হয়ে যায়। এমতাবস্থায় অনুতপ্ত হওয়া এবং আপোষের জন্য আগ্রহী হওয়া কোনো কাজে আসে না। অবশ্য তালাকপ্রাপ্তা মাহিলার যদি ইদ্দত শেষে অন্যত্র বিবাহ হয় এবং দুর্ভাগ্যবশত সেই স্বামী কর্তৃকও তালাকপ্রাপ্তা হয় বা স্বামী মারা যায় তাহলে ইদ্দত শেষে সে প্রথম স্বামীর জন্য পুনরায় হালাল সাব্যস্ত হবে এবং উভয়ে সম্মত হলে নতুন মহর ধার্য করে আবার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে।

এ পদ্ধতিতে দীর্ঘ সময় স্ত্রীকে পুনঃগ্রহণের অবকাশ পাওয়া যায় এবং তালাকের কারণে সৃষ্ট সমস্যা নিয়েও ভাববার সুযোগ থাকে।

উল্লেখ্য, তালাকের সময় স্ত্রী গর্ভবতী হলে সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত তার ইদ্দতের সময়। আর গর্ভবর্তী না হলে তিন হায়েয অতিক্রম করা পর্যন্ত।

যদি এ সময়ের মধ্যে চিন্তা-ভাবনার পর উভয়ে নিজেদের ভুল বুঝতে পারে এবং বৈবাহিক সম্পর্ক বহাল রাখতে সম্মত হয়, স্ত্রী নিজের দোষ-ত্রুটি সংশোধনের ওয়াদা করে, স্বামীর কথা মেনে চলতে রাজি হয়, স্বামীও সন্তান-সন্ততির কথা মাথায় রেখে স্ত্রীর সাথে সুন্দরভাবে জীবন যাপন করতে চায় তাহলে পেরেশান হওয়ার দরকার হয় না। পুনরায় স্ত্রীর সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে ফেলাই যথেষ্ট। আগের মতোই তারা স্বামী-স্ত্রী হয়ে যায়।

এক্ষেত্রে সর্বোত্তম হল, স্বামী দুইজন পুরুষ কিংবা একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলার সামনে বলবে, আমি আমার স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করলাম। যাতে পরিচিতদের মাঝে কোনো ভুল ধারণা সৃষ্টি না হয় এবং তালাকের মতো স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়ার বিষয়ও সবার জানা হয়ে যায়।

২. যদি বিচ্ছেদের পর দাম্পত্য জীবনের সুখ-শান্তির কথা মনে পড়ে, পরস্পরের গুণ ও অবদান স্মরণ হয় এবং আবার তারা দাম্পত্য জীবন শুরু করতে চায় তাহলে নতুন মহর ধার্য করে বিবাহবন্ধনে

আবদ্ধ হতে পারবে। প্রথম তালাকের ইদ্দত শেষ হয়ে গেলেও এক্ষেত্রে অন্যত্র বিবাহের প্রয়োজন হবে না। দুর্ভাগ্যবশত দ্বিতীয়বারও তাদের মাঝে বনিবনা না হলে এবং আল্লাহ না করুন পুনরায় তালাক দেওয়ার পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে সেক্ষেত্রেও ইসলামী দিক নির্দেশনার পূর্ণ অনুসরণ করবে। তাতে কাজ না হলে স্ত্রীকে তালাকে আহসান দিবে। অর্থাৎ স্ত্রী হায়েয থেকে পবিত্র থাকা অবস্থায়-যে সময়ে স্বামী তার সাথে সহবাস করেনি-সুস্পষ্ট ভাষায় এক তালাক দিবে।

শরীয়ত এমতাবস্থায়ও বিবাহ টিকিয়ে রাখার সুযোগ রেখেছে। স্ত্রীকে ইদ্দতের মধ্যে ফিরিয়ে নিতে পারবে আর ইদ্দত শেষ হলে নতুন করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। তবে স্বামী যেহেতু স্ত্রীকে দুই ধাপে দুই তালাক প্রদান করেছে তাই এখন শুধু একটি তালাক তার অধিকারে আছে। এই তৃতীয় তালাক প্রদান করলে আর স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়ার সুযোগ থাকবে না এবং পুনরায় বিবাহও করতে পারবে না। কেননা এই সুযোগ দুই তালাক পর্যন্তই সীমিত। যে ব্যক্তি উপরোক্ত পদ্ধতিতে দুই তালাক দেওয়ার পর পুনরায় বৈবাহিক সম্পর্ক কায়েম করবে তকে আগামী দিনগুলোতে খুব হিসাব নিকাশ করে চলতে হবে। কেননা একটু অসতর্কতার কারণে তৃতীয় তালাক দিয়ে ফেললে আর এই স্ত্রীকে নিয়ে ঘরসংসার করার সুযোগ থাকবে না; বরং মহিলাটি তার জন্য সম্পূর্ণ হারাম হয়ে যাবে। এজন্য খুব সাবধান থাকতে হবে।

মোটকথা 'আহসান' পদ্ধতিতে তালাক দিলে তালাক-পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে স্বাভাবিকভাবে চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ পাওয়া যায়। ধীর-স্থিরভাবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়। তাড়াহুড়া করে অনাকাংখিত কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় না। পক্ষান্তরে একসাথে তিন তালাক দিলে এই অবকাশগুলো থাকে না এবং তা কোনো সুফলও বয়ে আনে না; বরং স্বামী-স্ত্রী উভয়ে যন্ত্রনায় ছটফট করতে থাকে। জীবন চলা তাদের জন্য দুর্বিষহ হয়ে পড়ে।

সুতরাং একটু খোলা মনে চিন্তা করে দেখুন দাম্পত্য সম্পর্ক অটুট রাখার জন্য শরীয়তের ভূমিকা কত গুরুত্বপূর্ণ। পারস্পরিক কলহ-বিবাদ দূর করার জন্য পর্যায়ক্রমে পদক্ষেপ গ্রহণ করার আদেশ করেছে। মিলে মিশে থাকার কোনো পথ খোলা না থাকলে বিশেষ পদ্ধতিতে তালাক দেওয়ার হুকুম দিয়েছে।

অর্থাৎ স্ত্রী হায়েয থেকে পবিত্র থাকা অবস্থায় এক তালাক দিবে। কেননা হায়েয অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দেওয়া মারাত্মক গুনাহ এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

পরবর্তীতে স্ত্রীর প্রতি মুহাববত প্রকাশ পেলে ইদ্দতের মধ্যে তাকে গ্রহণ করতে পারবে। ইদ্দত শেষ হয়ে গেলে নতুন বিবাহের মাধ্যমে দাম্পত্য সম্পর্ক পুনরায় স্থাপিত হওয়া সম্ভব। কিন্তু তিন তালাক দিলে স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করার বা নতুন করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সুযোগ থাকে না। এভাবেই ইসলামী শরীয়ত বৈবাহিক সম্পর্ক অটুট রাখার অবকাশ দিয়েছে। কিন্তু অনেক মানুষই শরীয়তের এই সহজ পদ্ধতি উপেক্ষা করে। তিন তালাকের কঠিন হুকুম তা তাদের উপর আরোপিত হয়ে যায়। অর্থাৎ বিবাহ ভেঙ্গে যায় এবং তারা পরস্পরের জন্য সম্পূর্ণ হারাম হয়ে যায়। এখন মহিলাটির অন্যত্র বিবাহ হলে এবং সেই স্বামী কর্তৃক তালাকপ্রাপ্তা হলেই কেবল প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে।

অনেকে শরীয়তের পন্ডিত সেজে বলতে থাকে, অন্তরের নিয়ত ছাড়া শুধু রাগের মাথায় তিন তালাক দিলে তিন তালাকই হয়ে যাবে-এটা কেমন কথা? এ ধরনের আরো অনেক তর্ক ও অসার যুক্তির অবতারণা করে থাকে। তাদের যুক্তির খণ্ডনে যুক্তি দিয়ে বলা যায়, একটি কাজ যদি অন্যায় হয় তবে তা করা নিষিদ্ধ হবে, কিন্তু করে ফেললে তার ক্রিয়া প্রকাশিত হবে না-এটাই বা কেমন কথা? কোনো মানুষকে হত্যা করা জঘন্য অপরাধ এবং কবীরা গুনাহ। কিন্তু কেউ যদি ঘটনাক্রমে কাউকে গুলি করে মেরে ফেলে তখন কি এই তর্ক তাকে বাঁচিয়ে তুলবে যে, যে গুলি করেছে সে কি ন্যায় করেছে না অন্যায় করেছে?

তালাক দেওয়ার ভুল পদ্ধতি এবং তার কুফল

ইসলামী শরীয়তে একান্ত প্রয়োজনে তালাক দেওয়ার অবকাশ রাখা হয়েছে এবং সেজন্য সুন্দর পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে পদ্ধতি উপেক্ষা করতে দেখা যায়। আবার কোথাও পুরোপুরি উপেক্ষা করা না হলেও যথাযথ অনুসরণ করা হয় না। সমাজে তালাক দেওয়ার

বিভিন্ন ভুল পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে এবং দিন দিন নতুন নতুন পদ্ধতির কথা শোনা যাচ্ছে। এর মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট এবং শরীয়ত পরিপন্থী পদ্ধতি, যার কারণে একটি সুখী সংসার নিমিষেই শেষ হয়ে যায় এবং স্বামী-স্ত্রী উভয়ে অন্তর্জ্বালায় জ্বলতে থাকে তা হল-একসাথে তিন তালাক দেওয়া। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে এভাবেই তালাক দেওয়া-নেওয়া হয়। অনেকে একেই তালাক দেওয়ার একমাত্র পদ্ধতি মনে করে। এটা ছাড়া ভিন্ন পন্থায় তালাক দিলে তালাক দেওয়া হয়েছে বলে মনে করে না।

এই ভুল রেওয়াজ এতই ব্যাপক যে, তালাক কার্যকরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোও এভাবেই তালাক কার্যকর করে থাকে। তদ্রূপ শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনী-দরিদ্র সব শ্রেণীর লোকদের মধ্যেই এই প্রবণতা দেখা যায় যে, তারা যখন রাগে ক্ষোভে অথবা সিদ্ধান্ত নিয়ে লিখিত বা মৌখিকভাবে তালাক দেয় তখন একসাথে তিন তালাকই দিয়ে থাকে। এর কম তালাক দেওয়ার কোনো পন্থা আছে কি না সেটা জানারও প্রয়োজন বোধ করে না।

কখনও এমনও ঘটে যে, কেউ যদি এক তালাক বা দুই তালাক দেয় তাহলে তাকে তৃতীয় তালাক দিতে বাধ্য করা হয় এবং নানা রকম হুমকি-ধমকি দিয়ে, ঠাট্টা বিদ্রূপ করে কিংবা যেকোনো ভাবে উত্তেজিত করে তৃতীয় তালাক দেওয়ার পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়। দৃশ্যটা এমন থাকে যে, যতক্ষণ স্বামী তিন তালাক না দিচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত না সে নিজে ঠান্ডা হয়, না স্ত্রী, না অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন। সন্তান-সন্ততির ভবিষ্যতের কথা, সংসার ভাঙ্গার কথা, দুই পরিবারের মাঝে শত্রুতা ও সংঘাতের কথা কোনোটাই মাথায় থাকে না। যেই তিন তালাক দেওয়া হল অমনি সবাই শান্ত সুবোধ হয়ে গেল। এখন ছোট ছোট সন্তানের কথা মনে পড়ে, নিঃষ্পাপ সন্তানদের চেহারা চোখের সামনে ভেসে উঠে এবং ঘর ভাঙ্গা সংসারের চিত্রটা এমন বিভৎস আকারে ধরা দিতে থাকে যে, প্রত্যেকে নিজের ভুল বুঝতে পারে। স্বামী-স্ত্রী নিজেদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়। মাফ চাওয়া-চাওয়ির মাধ্যমে অতীত ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করে বৈবাহিক সম্পর্ক পুনর্বহাল করতে মরিয়া হয়ে যায়। কিন্তু ততক্ষণে বড় দেরি হয়ে গিয়েছে। নিজ হাতে সকল সুযোগ বিনষ্ট করা হয়েছে। তালাক দেওয়ার শরীয়তসম্মত পদ্ধতি অনুসরণ না করার কারণে স্ত্রী তার জন্য সম্পূর্ণ হারাম হয়ে গিয়েছে। এখন স্ত্রীকে ইদ্দত চলা অবস্থায়ও পুনরায় গ্রহণ করারও সুযোগ নেই, নতুন করে বিবাহ করারও সুযোগ নেই। উপরন্তু শরীয়তের নিয়ম

অমান্য করে মারাত্মক গুনাহ্ করা হয়েছে। আর অন্যায়ভাবে তালাক দেওয়া হলে স্ত্রীর উপরও চরম যুলুম করা হয়েছে, যা আরেকটি কবীরা গুনাহ ও হারাম।

যারা তিন তালাক দেওয়ার পর শরীয়তের বিধান জানতে মুফতী সাহেবদের কাছে আসেন তাদের অনেককে দেখা যায়, অত্যন্ত অসহায়ত্বের সাথে নিজের দুঃখের কথা বলে মুফতী সাহেবের মন গলাতে চেষ্টা করেন। নিষ্পাপ সন্তানদের কথা বলেন আর চোখ থেকে অশ্রু ঝরে। বিনয়ের সাথে অনুরোধ করতে থাকেন যেভাবেই হোক কোনো হিলা-বাহানা বের করে তার পরিবারটাকে যেন ধ্বংস হওয়া থেকে বাঁচানো হয়।

এমনকি তিন তালাকের হুকুম নস্যাৎ করার জন্য বিশেষ কোনো কাফফারা থাকলে তা যেন বাতলে দেওয়া হয়। মোটকথা, যেকোনো উপায়ে দাম্পত্য সম্পর্ক ফিরে পাওয়ার জন্য অনুনয় বিনয় করতে থাকে। কিন্তু তাদের এ সকল আবদার-অনুরোধ বিফল। এতে শরীয়তের বিধানে পরিবর্তন হয় না। স্ত্রী তার জন্য সম্পূর্ণ হারাম হয়ে গেছে। আর এটা হয়েছে শরীয়তের নিয়ম লঙ্ঘন করে একসাথে তিন তালাক দেওয়ার কারণে। এখন পুনরায় তাকে স্ত্রী রূপে ফিরে পাওয়ার যে সম্ভাবনাটি রয়েছে তা অত্যন্ত দূরবর্তী সম্ভাবনা। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় বৈধ পন্থার পরিবর্তে নানা রকম হিলা-বাহানার আশ্রয় নেওয়া হয়, যা যেমন অশালীন তেমনি শরীয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ ও লানতযোগ্য কাজ।

রুজু করার মনগড়া পদ্ধতিসমূহ

অনেক জায়গায় তালাকের শরয়ী বিধান উপেক্ষা করা হয়। স্পষ্ট তিন তালাক দেওয়া সত্ত্বেও তালাকপ্রাপ্তা মহিলার সাথে অনায়াসে ঘর-সংসার করতে থাকে। এমনও শোনা যায়, তালাক দেওয়ার পর স্ত্রী বাপের বাড়ি চলে গেছে। পরে তালাকদাতা চাপে পড়ে কিংবা মনের টানে মহিলাটিকে নিজ বাড়িতে ফিরিয়ে এনেছে এবং স্বামী-স্ত্রীর মতো জীবন-যাপন করছে। অথচ এভাবে তালাকপ্রাপ্তাকে ফিরিয়ে আনা এবং একসাথে জীবন-যাপন করা সম্পূর্ণ হারাম।

সমাজে এমনও ঘটে যে, এভাবে হারাম জীবন-যাপনের পক্ষে অনেক প্রগতিবাদী 'মুরববী'র সমর্থন থাকে। সান্ত্বনার সুরে একেকজন একেক ধরনের উপদেশ দেন আর বলতে থাকেন, আরে রাগের মাথায় তালাক দিলে স্ত্রী তালাক হয় না। অন্তরে তালাকের নিয়ত না থাকলে তালাক হয় না। স্ত্রী তালাক দেওয়ার সময় নিজ কানে না শুনলে তালাক হয় না। স্ত্রী যদি তালাকের রেজিস্ট্রি গ্রহণ না করে ফিরিয়ে দেয় তাহলে তালাক হয় না। যতক্ষণ স্ত্রী তালাকনামা না পড়বে এবং কবুল না করবে ততক্ষণ তালাক কার্যকর হয় না। শুধু লিখে তালাক দিলে তালাক হয় না, মুখে উচ্চারণ করতে হয়। স্ত্রী গর্ভবতী থাকা অবস্থায় তালাক দিলে তালাক হয় না ইত্যাদি। এভাবে একের পর এর তালাকের 'সমাধান' বাতলাতে থাকে। এগুলো সব জাহেল ও মুর্খদের অজ্ঞতাপ্রসূত ও মনগড়া যুক্তি, যা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। নিঃসন্দেহে এ সকল ক্ষেত্রেও শুরু থেকেই তিন তালাক কার্যকর হয়ে যাবে। সুতরাং তিন তালাক দেওয়ার পর এভাবে স্ত্রীকে পুনঃগ্রহণ করার অর্থ হল, প্রকাশ্য ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া। তারা যতদিন একসাথে জীবন কাটাবে ততদিন হারাম কাজের মধ্যেই জীবন অতিবাহিত হবে। এতে শুধু তালাকদাতা এবং তালাকপ্রাপ্তা গুনাহগার হবে না; বরং তাদেরকে এই হারাম জীবন-যাপনের সুযোগ যারা করে দিয়েছে তারাও গুনাহগার হবে।

কেউ কেউ তিন তালাক দেওয়ার পর তা গোপন রাখে। ঘটনাক্রমে দু' একজন জেনে ফেললেও সাক্ষী প্রমাণ না থাকার কারণে সাফ অস্বীকার করে বসে। কখনও কখনও তিন তালাক দেওয়া সত্ত্বেও এক তালাক বা দুই তালাক দেওয়ার কথা প্রচার করে। এভাবে মিথ্যা বলে তিন তালাকের হুকুম-স্ত্রী সম্পূর্ণরূপে স্বামীর জন্য হারাম হয়ে যাওয়া- থেকে বাঁচতে চায়। অতঃপর যখন মুফতী সাহেবের কাছে ফতোয়া নেওয়ার জন্য আসে তখন তিন তালাককে দুই তালাক বানিয়ে কাগজে লিখে দেয়। মুফতী সাহেব যেহেতু গায়েব জানে না তাকে লিখিত বিষয়ের উপর নির্ভর করে, প্রয়োজনে মৌখিক বক্তব্যের মাধ্যমে যাচাই করে উত্তর প্রদান করতে হয়। যদি প্রশ্নপত্রে দুই তালাকের কথা উল্লেখ থাকে তাহলে তিনি দুই তালাকের শরয়ী হুকুম অনুযায়ী ফতোয়া প্রদান করবেন। ফলে উত্তরপত্রে দেখা যাবে দুই তালাকের বিধানানুযায়ী মহিলাটি তালাকদাতার জন্য এখনও সম্পূর্ণ হারাম হয়নি। (যদিও কার্যত আল্লাহর বিধানে মহিলাটি তালাকাদাতার জন্য সম্পূর্ণ হারাম হয়েছে। কেননা, তাকে তিন তালাক

প্রদান করা হয়েছে) এই ফতোয়া প্রদানের ক্ষেত্রে মুফতী সাহেব কোনো ভুল করেননি। তিনি তার দায়িত্ব যথাযথ পালন করেছেন। কিন্তু প্রশ্নকর্তা এখানে খেয়ানত করেছে। সত্যের বিপরীতে মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে। তিন তালাককে দুই তালাক বানিয়েছে এবং তিন তালাকের পরিবর্তে দুই তালাকের হুকুম নিয়ে নিয়েছে।

যদিও সে মুফতী সাহেবকে ধোকা দিয়েছে এবং হয়তো এই ফতোয়া নিয়ে এলাকাবাসীকেও ধোকা দিবে, কিন্তু আল্লাহকে তো ধোকা দিতে পারবে না। তার সকল কাজ আল্লাহ জানেন। এলাকাবাসীর প্রতিবাদের ভয়ে হয়তো এই ফতোয়াকে সনদ বানিয়ে প্রচার করবে যে, অমুক মুফতী সাহেব কিংবা অমুক বড় মাদরাসা থেকে এই ফতোয়া দেওয়া হয়েছে। সত্য গোপন করা হবে। সমাজ তাদেরকে স্বামী-স্ত্রী মনে করবে, কিন্তু শরীয়তের বিচারে মহিলাটি তালাকদাতার জন্য হালাল হয়ে যাবে না; বরং বিধান অনুযায়ী হারামই থাকবে এবং তাদের মেলামেশা ব্যভিচার বলে গণ্য হবে। এই জঘন্য অপরাধের কারণে পরকালে কঠিন শাস্তি তাদেরকে ভোগ করতে হবে।

কেউ কেউ তিন তালাকের কঠিন হুকুম থেকে বাঁচার জন্য শরীয়তের বিধানের মধ্যে ফাঁক-ফোকর তালাশ করে থাকে। যখন ফিকহে হানাফীতে কোনো ছাড়-মহিলাটিকে পুনরায় গ্রহণ করার সুযোগ- খুঁজে পায় না তখন হানাফী মাযহাব ছেড়ে গায়রে মুকাল্লিদদের কাছে ধর্ণা দেয়। কারণ তাদের প্রোপাগান্ডা হল, একসাথে একই মজলিসে তিন তালাক দিলেও এক তালাক হয় এবং স্বামী পুনরায় তালাকপ্রাপ্তাকে গ্রহণ করতে পারে।

যারা এই ব্যতিক্রমী মত অনুসরণ করবে তারা নিঃসন্দেহে অবৈধ জীবন যাপন করতে থাকবে। কারণ এই মত কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস, শরীয়তের এই চার দলীলের সম্পূর্ণ বিরোধী। এছাড়া সাহাবা, তাবেয়ীন, প্রসিদ্ধ চার ইমাম এবং জুমহুরে উম্মতের অনুসৃত মত ও আমলের পূর্ণ খেলাফ। অতএব গুটি কতক মানুষের ভ্রান্ত মত অনুসরণ করে সারা জীবন হারাম কাজে অতিবাহিত করা নিজের জন্য জাহান্নামের গর্ত খোঁড়া ছাড়া আর কিছু নয়।

আমাদের ভুল এই যে, বিবাহের আগে তালাকের মাসআলা ভালোভাবে জানি না এবং জানারও প্রয়োজন বোধ করি না। এমনকি বিবাহের পরও তালাকের মাসআলা জানার চেষ্টা করি না। ফলে এই ভুলের খেসারত পরে দিতে হয়। যদি মাসআলা জানার বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হত তাহলে নির্দ্বিধায় তিন তালাক দেওয়ার সাহস হত না এবং সুখের সংসার ভেঙ্গে যেত না। দুই পরিবারের মাঝে শত্রুতা সৃষ্টি হত না এবং অনাকাংখিত পরিস্থিতির শিকার হতে হত না। সুতরাং হুট করে তিন তালাক দিতে উদ্যত হবে না। রাগের অবস্থায় ভুলেও তালাকের নাম নিবে না। প্রচন্ড রাগ হলে নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করবে। সম্ভব হলে দ্রুত স্থান ত্যাগ করবে। তালাক দিলেই যে জীবনে শান্তি ফিরে আসবে এমন তো নয়। তাই ধৈর্য্য ধারণ করাই শ্রেয় এবং শরীয়তের পদ্ধতিতে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা কর্তব্য।

তালাকদাতার জন্য মহিলাটি কখন হালাল হবে

তালাকপ্রাপ্তা মহিলা যদি ইদ্দত শেষে অন্যত্র বিবাহ হয় এবং সে স্বামীর সাথে তার নিশ্চিত মেলামেশা হয় অতঃপর সেই স্বামী কোনো কারণে স্বেচ্ছায় মহিলাটিকে তালাক দেয় কিংবা স্বামীর মৃত্যু হয় তাহলে মহিলাটি ইদ্দত পালন করার পর পূর্ণ স্বাধীন থাকবে-ইচ্ছা করলে অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। আবার ইচ্ছা করলে প্রথম স্বামীর সাথে বিবাহ বসতে পারবে। তাকে প্রথম স্বামীর সাথে বিবাহে বাধ্য করা যাবে না; তারা নিজেরা যদি পুনরায় দাম্পত্য সম্পর্কে আগ্রহী হয় তাহলে নতুন মহর ধার্য করে স্বাক্ষীদের উপস্থিতিতে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে।

এক্ষেত্রে মনে রাখা প্রয়োজন যে, দ্বিতীয় স্বামীকে জোর করে তালাক দিতে বাধ্য করা সম্পূর্ণ নিষেধ এবং বিবাহের আগে এই শর্ত জুড়ে দেওয়া যে, বিবাহের পর দ্বিতীয় স্বামী অবশ্যই স্ত্রীকে তালাক দিতে বাধ্য থাকবে, সম্পূর্ণ নাজায়েয। কেউ যদি এ রকম করে তাহলে সেটা আল্লাহর লানত ও আযাবের কারণ হবে। হাদীস শরীফে এসেছে, যে ব্যক্তি এভাবে (শর্তের সাথে) হালাল করার দায়িত্ব নিবে এবং যার জন্য করবে উভয়ের উপর আল্লাহর লানত।

বলাবাহুল্য যে, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন কোনো মানুষ কখনই তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকে ঘরে উঠানোর জন্য হিলা বাহানার পথ বেছে নিতে পারে না। এটা সুস্থ আকলেরও পরিপন্থী। সুতরাং তালাকের ক্ষেত্রে কুরআন-হাদীসের নির্দেশনা যথাযথ অনুসরণ করা কর্তব্য এবং সুস্থ সুন্দর জীবন যাপনের ব্যবস্থা করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।

একসাথে তিন তালাক

যদি কেউ পূর্বাপর না ভেবে ঠান্ডা মাথায় হোক কি রাগের ঝোঁকে হোক একসাথে তিন তালাক দিয়ে ফেলে তাহলে সে একটি মারাত্মক অপরাধ করল এবং এক নিমিষেই একটি সুখের সংসার তছনছ করে দিল। সে নিজেই কৃতকর্মের কুফল টের পাবে। এভাবে তালাক দেওয়া মারাত্মক গুনাহ এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কিন্তু কেউ দিয়ে ফেললে এই যুক্তি চলবে না যে, সে অন্যায়ভাবে তালাক দিয়েছে অতএব তা কার্যকর হবে না। কিংবা শুধু এক তালাক হবে। যারা এরূপ ধারণা করেন তারা শরীয়তের বিধান না জানার কারণে করে থাকেন। শরীয়তের বিধান হল, তালাক সংকল্প করে দিক অথবা ঠাট্টাচ্ছলে, খেল-তামাশা করে দিক সর্বাবস্থায় তালাক কার্যকর হয়ে যাবে। আর স্পষ্ট শব্দে তালাক দেওয়ার সাথে অন্তরের নিয়ত থাকা শর্ত নয়। সুতরাং যেভাবেই হোক একসাথে তিন তালাক দেওয়ার সাথে সাথেই স্ত্রীর উপর তিন তালাক কার্যকর হয়ে যাবে।

একাধিক সহীহ হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একসাথে তিন তালাক দেওয়াকে তিন তালাকই গণ্য করেছেন। যদিও এভাবে তালাক দেওয়ার কারণে অত্যন্ত রাগান্বিত হয়েছেন।

প্রথম হাদীস

عن محمود بن لبيد قال : أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبان، فقال : أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ فقام رجل فقال : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أقتله.

মাহমুদ ইবনে লাবীদ বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানানো হল যে, জনৈক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছে। তিনি (একথা শুনে) রাগান্বিত হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, তোমাদের মাঝে আমি থাকা অবস্থায় আল্লাহর কিতাবের সাথে উপহাস করা হচ্ছে? এ সময় এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি তাকে কতল করব না?- সুনানে নাসায়ী ২/৯৮

এই হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একসাথে তিন তালাক দেওয়ার উপর নেহায়েত অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন এবং কেউ কেউ তার ওই কাজকে হত্যাযোগ্য অপরাধ মনে করেছেন। আর এ কথা কোথাও নেই যে, তিনি এই তিন তালাককে তালাক হিসেবে গণ্য করেননি অথবা এটাও এক তালাকে রজয়ী করে মহিলাটিকে তালাকদাতার কাছে ফিরিয়ে দিয়েছেন।

কাজী আবু বকর ইবনুল আরাবী এই হাদীসে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন তালাকের হুকুম কার্যকর করেছেন।

দ্বিতীয় হাদীস

সাহাবী উয়াইমির আজলানী রাহ. সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি এবং তার স্ত্রী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে লিআন করলেন। যখন লিআন শেষ হল, তখন উয়াইমির রা. বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এখন যদি আমি তাকে আমার কাছে রাখি তাহলে আমি মিথ্যাবাদী। অতঃপর উয়াইমির রা. হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে স্ত্রীকে তিন তালাক দিলেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা কার্যকর করলেন এবং তাদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটালেন।-সহীহ বুখারী হাদীস ৫৩০৯; সুনানে দাউদ হাদীস ২২৫০

এই হাদীস থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন তালাককে তিন তালাকই গণ্য করেছেন এবং তার হুকুমও কার্যকর করেছেন। আর পূর্বে উল্লেখিত মাহমুদ ইবনে লাবীদের হাদীসটিও তা প্রমাণ করে। পক্ষান্তরে কোথাও একথা পাওয়া যায় না যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একসাথে দেওয়া তিন তালাককে তালাক সাব্যস্ত করেননি বা এক তালাকে রজয়ী গণ্য করেছেন।

তৃতীয় হাদীস

হযরত আলী রা.-এর শাহাদাতের পর যখন হযরত হাসান রা. খলীফা নির্বাচিত হলেন তখন তার স্ত্রী আয়েশা খাছআমিয়া তাকে মোবারকবাদ জানান। হযরত হাসান রা. স্ত্রীকে বললেন, তোমার এই মোবারকবাদ কি হযরত আলী রা.-এর শাহাদাতের কারণে? তুমি এতে খুশি প্রকাশ করছ? তোমাকে তিন তালাক দিলাম।

যখন তার ইদ্দত শেষ হয়ে গেল তখন হাসান রা. তার অবশিষ্ট মহর এবং অতিরিক্ত দশ হাজার দিরহাম পাঠিয়ে দিলেন। আয়েশা খাছআমিয়ার হাতে যখন এগুলো পৌঁছল তিনি বলতে লাগলেন, প্রিয়ের বিচ্ছেদের তুলনায় এ সম্পদ অতি তুচ্ছ। হযরত হাসান রা. যখন এ কথা শুনলেন তখন অশ্রুসিক্ত নয়নে বললেন-

لو لا أني سمعت جدي أو حدثني أبي أنه سمع جدي يقول : أيما رجل طلق امرأته ثلاث عند الأقراء أو ثلاثا مبهمة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره لراجعتها.

আমি যদি নানাজানকে বলতে না শুনতাম কিংবা বলেছেন, আমার আব্বার মাধ্যমে নানাজানের এ কথা না শুনতাম, 'যে ব্যক্তি স্ত্রীকে হায়েয থেকে পবিত্র অবস্থায় পর্যায়ক্রমে তিন তালাক দিল কিংবা একসাথে তিন তালাক দিল তার জন্য ওই স্ত্রী হালাল হবে না অন্য পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া ছাড়া, তাহলে আমি তাকে ফিরিয়ে আনতাম। - আসসুনানুল কুবরা ৭/৩৩৬

চতুর্থ হাদীস

عن عبادة بن الصامت قال : طلق جدي امرأته له ألف تطليقة، فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته، فقال : أما اتقى الله جدك، أما ثلاثة فله، وأما تسع مأة وسبعة وتسعون فعدوان وظلم، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له.

উবাদা ইবনে ছামেত রা. বলেন, আমার দাদা তার স্ত্রীকে 'এক হাজার তালাক' দিলেন। আমি তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গিয়ে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন,

তোমার দাদা কি আল্লাহকে ভয় করেনি? তিনটি তো তার অধিকার (যা কার্যকর হয়ে গেছে) আর বাকি নয়শত সাতানববইটি হল সীমালঙ্ঘন ও জুলুম। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন অথবা শাস্তিও দিতে পারেন।

এসকল হাদীস দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, একসাথে তিন তালাক প্রদান করলে তিন তালাকই হয়। নানা রকম হিলা-বহানা করে তিন তালাককে বাতিল তালাক অথবা এক তালাকে রজয়ী সাব্যস্ত করার অপচেষ্টা মুর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এর কারণে মহিলা কখনও হালাল হয়ে যাবে না।

সারকথা হল, বিবাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর জন্য সময় নিয়ে প্রস্ততি গ্রহণ করতে হয়। অনেক বুঝে, চিন্তা-ফিকির করে শরীয়তসম্মত পন্থায় বিবাহ সম্পন্ন করতে হয়। তাই আগ-পিছ না ভেবে হুট করে তালাক প্রদান করা কখনই উচিত নয়। যখন তালাক দেওয়া ছাড়া কোনো উপায় থাকবে না তখন শরীয়তের নির্দেশিত পন্থায় তালাক দিবে। চিন্তা-ভাবনা ছাড়া শুধু রাগের বশবর্তী হয়ে নির্দ্বিধায় তালাক দিয়ে ফেলা শুধু অবৈধ ও গুনাহই নয়; বরং সামাজিক জীবনেও এর মারাত্মক ক্ষতি রয়েছে। এর ফলে দুঃখ-দুর্দশা, হতাশা ও দুশ্চিন্তা ভর করে।

একমাত্র শান্তি ও কামিয়াবি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে শিক্ষা ও নির্দেশনা উম্মাতের মাঝে রেখে গেছেন তার মধ্যে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ঐ নির্দেশনার উপর অবিচল থাকা আবশ্যক। সমস্ত ভুল পথ ও পদ্ধতি পরিহার করে চলতে হবে। পূর্বের গুনাহের জন্য আল্লাহর কাছে কায়মনো বাক্যে ইস্তেগফার করতে হবে। আগামী জীবন নবীর আদর্শ অনুসরণ করে পরিচালনা করতে দৃঢ় সংকল্প করতে হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে কবুল করুন। আ- মীন।

প্রবন্ধ সংগ্রহ সূত্রঃ

http://www.alkawsar.com/article/1476/

http://www.alkawsar.com/article/1457

http://www.alkawsar.com/article/1444/